ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 303- 309
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.211

সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পে সমাজ-দর্শন ভাবনা

অরূপ কুমার পাল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Literature is the mirror of society. It reflects the lifestyle, problems, aspirations, customs, values and beliefs of social people where social philosophy discusses the structure, functions, and changes of society. Social philosophy helps to understand the deeper aspects of society through literature. Literature written at a particular time reflects the social, economic and political conditions of the society at that time. Social philosophy analyzes those reflections and portrays a holistic picture of the society of that time. Literature and social philosophy are closely related to each other. Society and philosophy have had a profound impact on Bengali short stories. From the late 19th century to the early 20th century short stories have shed light on social and moral issues. The works of writers like Rabindranath Tagore, Sarat Chandra Chattopadhaya, Bibhutibhushan Bandhyopadhaya and others are particularly noteworthy in this genre. In their stories, they highlight the prevailing customs, superstitions, class discrimination, and the relationship between men and women. In the 20th century, the short story genre developed further and included politics, identity crises, existentialism and a variety of complex themes. Writers like Manik Bandhyopadhaya, Tarashankar Bandhyopadhaya, Adwaitya Mallabarman have portrayed political and social unrest, famine, partition and the struggle for human survival in their writings. Santosh Kumar Ghosh's short stories are influenced by the post 1930's period. Therefore, the social, political and economic problems of the post 1930's period can be observed in his works. His short stories deal with the civil unrest following World War II, partition, financial hardship, job crisis, prostitution, landlord-tenant relationships, Love, extramarital affairs, live-in relationships, psychological conflicts and the decline of morals are among the themes that emerge in his stories. Here, we have placed fifty of his short stories at the center of our discussion.

Keywords: Santosh Kumar Ghosh, Short stories, Society and Philosophy, Civic Issues of period, Relationships

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আর্থিক অনটন। যার জেরে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে শুরু করে কাজ হারানো এমনকি দাম্পত্য জীবনেও তার প্রভাব পড়েছিল। সন্তোষকুমারের 'কানাকড়ি' গল্পে পারিবারিক দাম্পত্য জীবনের মূল্যবোধের বিচ্ছেদের মূলে রয়েছে আর্থিক অনটন। সামান্য চাকুরিজীবী মন্মথের চাকরি চলে যাওয়ার পর পরিবারে আর্থিক সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। চাকরি চলে যাওয়ার পর কাজের সন্ধান করলে মন্মথকে দরখাস্ত নিয়ে আসতে বলেন বড়বাবু। চাকরি গেলেও স্বামীর প্রতি ভরসা

অটুট ছিল স্ত্রী সাবিত্রীর। বড়বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার জন্য পোশাক-পরিচ্ছেদ ঠিক রাখতে হবে। তাই বিয়ের আংটি খুলে সাবিত্রী মন্মথের হাতে দিয়ে বলেছিল, ''কাল একজোড়া জুতো কিনবে তুমি।''[১] কোন পরিস্থিতি তৈরি হলে বিয়ের আংটি স্ত্রী খুলে বিক্রির জন্য স্বামীর হাতে তুলে দেয় তা সহজেই আমরা বুঝতে পারি।

'পনেরো টাকার বউ' গল্পে কোম্পানির সেলস্ অর্গানাইজার গৌরাঙ্গ মণিমালাকে বিয়ে করে। তাদের একটি সন্তান হয়। সুখের সংসার অসুখী হয়ে পড়ে গৌরাঙ্গের চাকরি চলে যাওয়ায়। এখানে দেখা যায় অর্থ উর্পাজনের জন্য মণিমালাকে থিয়েটার নামতে বলে স্বামী। যার ফলে স্বামীর প্রতি স্ত্রী মণিমালার বিশ্বাসের ভীত টাল খায়। পরবর্তীতে দেখা যায় টাকাপয়সার অভাবের জেরে ভাড়া বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে চলে আসতে হয় তাদের। যেখানে বাড়ি ভাড়ার মূল্যের উপর নির্ভর করে বস্তির বউদের নামকরণ করা হয়েছে।

পরিবারের কর্তার আকস্মিক মৃত্যু হলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনে যে আর্থিক বিপর্যয় নেমে আসে। আর সেই সংকট থেকে মুক্তি পেতে চরিত্রের স্খলনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। 'জোড় বিজোড়' গল্পে এমনই চিত্র ধরা পড়েছে। গল্পে সুসানের বাবা রিচার্ড ওয়েক এক রেল দুর্ঘটনায় মারা যান। সুসানের মা আর্থিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। আর্থিক সংস্থানের জন্য বাড়ির ভাড়াটিয়া স্যামুয়েলের সঙ্গে সুসানকে ঘনিষ্ঠ হতে বলতে দ্বিধা করেন না সুসানের মা। এখানে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক সমস্যার জেরে পেশাগত বদলও লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ নিশিকান্ত চক্রবর্তীকে পেট বাঁচাতে যজমানী ব্যবসা ছেড়ে শ্রমিক হতে হয়। 'দ্বিজ' গল্পে এমনই চিত্র ধরা পড়েছে সন্তোষকুমারের লেখনীতে। বস্তি আর মহিমপুর ক্যাম্পের শ্রমিকদের সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পাই নিশিকান্ত, গড়ে উঠে সুসম্পর্ক। নিশিকান্তের মন গভীরে নাড়া দিয়ে বলে উঠে,

> ''মনের মধ্যে যে উঁচু নিচু বোধটুকু তখনও ছিল, বার কয়েক কেঁপে কেঁপে যেন সমতল হয়ে গেল। অদৃষ্ট নিশিকান্ত চক্রবর্তীর খোরাক এই অন্ত্যজ মানুষ গুলোর সঙ্গে একই শানকিতে বেড়েছে, আলাদা পংঙতিতে বিড়ম্বনা আর কেন।''[২]

আর্থিক সমস্যা জাতপাতের ভেদাভেদ ভুলে একই করে দিয়েছে সব শ্রেণির মানুষকে।

দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে গ্রামের দুই বোনকে নিজেদের ইচ্ছে মত কাজ করতে বাধ্য করে শহুরে বাবুরা। 'হোলি' গল্পে দুই বোন রেখা ও লেখার সঙ্গে এমনই আচরণ করে বিজনবাবু, পরিমলবাবু এবং রবিদা নামের তিন চরিত্র। আর্থিক বৈষম্যের শিকার হয় দুই বোন। উল্টে দুই বোনকে অপবাদ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি শহুরে বাবুরা। এমনকি রেখার উপর মানসিক অত্যাচারও করেছে রবিদা। রেখার করুণ আর্তনাদ রবিদার কাছে ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসুস্থ মায়ের জন্য হাতে করে সন্দেশ নিয়ে যাওয়ার সময় রেখাকে চোর অপবাদ দেয় রবিদা এবং সপাটে গালে চড় বসায়। আবার দেখা যায়, রেখা গান গাওয়ার অক্ষমতার কথা জানালে রবিদা চিমটি কেটে রেখাকে দিয়ে ফের গান গাইয়েছেন এবং রবিদার মনে এক নিষ্ঠুর আনন্দ প্রকাশিত পেয়েছে। নৃশংস আচরণের মধ্যেও রেখার চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করে রবিদা বলে,

> ''ওসব মেয়ে কি টাইপের, জানতে আমার বাকি নেই, সব কুত্তির দাওয়াই জানি।''[৩]

অর্থাভাব কিভাবে মানুষের মনকে ছোট করে দেয় তার প্রমাণ হল 'ছোট কথা' গল্পটি। সরসিজ তার প্রাক্তন প্রেমিকা উষাকে স্বামী পরিমলের চিকিৎসার জন্য একশো টাকা দিতে চাইলে উষার মা সরসিজের কাছে টাকার জন্য হাত পাতে। স্বার্থান্ধ মায়ের পাশাপাশি গল্পে অন্য আরেকটি চিত্র দেখা দিয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির রাতে ফুটপাথবাসী এক ভিখিরি মেয়ে তার পরনের কাপড় খুলে তার বাচ্চাকে জড়িয়ে দিচ্ছে। বৈপরীত্য দুটি ছবি গল্পকার শিল্পসম্মত ভাবে গল্পে উপস্থাপিত করেছেন। আসলে দারিদ্র্য মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণ করে দেয় তেমনই রূপ প্রকাশ করতে চেয়েছেন গল্পকার।

'নকল' গল্পে বাড়ির কাজের মেয়ে সুখী সদ্য বিবাহিতা শীলা দিদিমণির নতুন রূপ দেখে মুগ্ধ। সুখী তারপর শীলা দিদিমণির মত নকল করতে থাকে। গল্পের শেষে সুখী বলে উঠে, ''দিদিমণির মতো সত্যিই কি আর আমরা হতে পারি! বড় জোর সাজতে পারি।''[৪] এই গল্পে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ছবি স্পষ্ট। দারিদ্র্য সুখীর মতো নারীদের ইচ্ছার

কোনো দাম দেয় না। তাই সুখী শশধরের দেওয়া টাকা ছুঁড়েও ফেলে দিতে পারে না। তার ইচ্ছা মেটাতে গিয়ে তাকে ধার করতে হয়েছে এবং সেই ধার মেটাবার জনাই অপমানিত বোধ করেও সুখী সেই টাকা ফেলে দিতে পারেনি।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে সংসারের হাল ধরতে বাধ্য হয়েই স্ত্রীকে পতিতা বৃত্তিতে নামতে হয়। 'কানাকড়ি' গল্পে নিজের চাকরি খুইয়ে মন্মথ স্ত্রীকে বিপথে যাওয়ার কথা জেনেও নিষেধ করতে পারেনি। মনের গভীরে সন্দেহ রেখেই মন্মথ একমুঠো ভাত মুখে নিয়ে সাবিত্রীকে বলে উঠে, ''তুমি বেশি মেশামেশি কোরো না। নিজে ঠিক থাকলেই হল। তোমাকে চিনি তো, খারাপ কিছু তোমার কাছে ঘেঁষতে পারে না।''[৫] একথা শুনে অবশ্য সাবিত্রীর মন ভরে গেল তার প্রতি স্বামীর ভরসা দেখে। গল্পে মল্লিকার হাত ধরেই সাবিত্রী দেহ-ব্যবসায় নামে। শশাঙ্কের পাশে বসে সিনেমা দেখলেও সাবিত্রী মন সায় দেয়নি।

'গিল্টি' গল্পে প্রেমিক সলিলের প্রস্তাবে প্রেমিকা সীতা দু'জনে মিলে শুরু করে দেহ ব্যবসা। এই ব্যবসাতে দু'জন দু'জনকে ঠকাতে চায়। ধরা পড়লে সীতা বলে আগরওয়ালার দেওয়ার ইয়ারিং গিল্টি, আর সলিল বলে আগরওয়ালার দেওয়া টাকা জাল। অর্থনৈতিক বিপর্যয় দুটি মানুষের মধ্যে রচনা করেছিল অবিশ্বাস! আর্থিক সংকট মানুষের মূল্যবোধকে কতখানি বিনষ্ট করেছিল গল্পটি তার অন্যতম নিদর্শন।

আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়ে প্রতুল চৌধুরীর মত ভোগবাদী লোক মানুষের জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছে, তাদের দেহে দিচ্ছে মারণ রোগ। বংশের একের পর এক সবাইকে তাদের করাল থাবা দিয়ে গ্রাস করছে। 'বিষকণ্ঠ' গল্পে দেখা যায় দেহ ব্যবসা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সুহাসের মধ্যে প্রতিবাদী সত্ত্বা জেগে উঠে। ভয়ঙ্কর ধ্বংসের হাত থেকে পরিবারের সকলকে রক্ষা করার অনুরোধ করে শুভেন্দুর হাত চেপে দৃঢ় কণ্ঠে বলে, ''আপনাকে সেরে উঠতেই হবে শুভেন্দুবাবু, আমাদের সবাইকে সারিয়ে তুলতে হবে।''[৬]

পরিস্থিতির চাপে পড়ে সুরমাকে নিতে হয় হোটেলের কাজ। শুধু কাজই নয় হোটেলের অতিথিদের শয্যাসঙ্গিনীও হতে বাধ্য করেছিল সুরমাকে। হোটেলে আগত পুরুষদের কেউ কেউ সুরমার শরীর উপভোগ করার পর প্রতিশ্রুতি দেয় পরে এসে তাকে নিয়ে যাবে, তাকে এই কারাগার থেকে মুক্ত করবে। শেষ পর্যন্ত সুরমার কাছে সব প্রতিশ্রুতিই ঠুনকো হয়ে দাঁড়ায়। 'যাদুঘর' গল্পে সমাজের নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়ের দিকটি প্রস্ফুটিত হয়। এখানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের ছায়া লক্ষ্য করা যায়।

আর্থিক অনটনের জেরে 'কানাকড়ি' গল্পে যেমন পতিতা বৃত্তিতে নামতে হয়েছিল স্ত্রী সাবিত্রীকে তেমনি উল্টো চিত্রও দেখা যাচ্ছে 'ঘর' গল্পে। এখানে গল্পের নায়িকা কৃষ্ণকুন্তলা দেহ ব্যবসায় পরিচিত হওয়া জলধরের সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল। এমনকি অনিচ্ছা সত্ত্বেও জলধরের জীবিকা-সঙ্গিনী হয়েছিল কৃষ্ণকুন্তলা। এক একটি মেয়েকে কমিশনের বিনিময়ে পিছল পথে ঠেলে দিয়েছে কৃষ্ণকুন্তলা। তার মন আত্মগ্লানিতে ভরে গিয়েছে। নিজের ঘর বাঁধতে গিয়ে সে বহুজনের ঘর গড়ার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। তারপর দেখা যায় জলধরের আশ্বাসে টাল খায়। একদিন কৃষ্ণকুন্তলা জানতে পারে জলধরের স্ত্রী রয়েছে। তখন কৃষ্ণকুন্তলার উপলব্ধি,

> ''জলধরের জীবিকা সঙ্গিনীই থাকতে হবে বরাবর। জীবনসঙ্গিনী কোনওদিন হতে পারব না। সারাজীবন শুধু কদর্য বৃত্তির কদন্নে ভুরিভোজন।''[৭]

'শনি' গল্পের প্রেক্ষাপটে রয়েছে নিষিদ্ধ পল্লীর পতিতা মাতঙ্গের কথা। মাতঙ্গ স্বপ্ন দেখে ছোট বাড়িতে যেখানে সন্ধ্যাবেলায় শাঁখ বাজবে, ধূপ সুরভি ঠাকুর ঘরে স্নিগ্ধতা এনে দেবে। মাতঙ্গের যৌবন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পরের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ নেয়। নিজের গৃহিনী হওয়ার স্বপ্ন সে মেয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করতে চাই। মেয়ে যমুনাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য মাতঙ্গ নিয়ে আসে 'সমাজ সংস্কারক' অফিসে। সমাজ সংস্কারক অফিসে সম্পাদক গিরিজাবাবুর কথা মত প্রকৃত পরিচয় গোপন করে জনৈক বিপত্নীক ডাক্তার নরেশের সঙ্গে যমুনার বিয়ে হয়।

পরিবারে আর্থিক অনটন। তা থেকে সহজেই মুক্তি পেতে দেহ ব্যবসার পথ খুঁজে নেওয়া হয়। কিন্তু অর্থই শেষ কথা বলে না। শেষ কথা বলে মন। আর সেই মনের মধ্যে শুরু হয় নিজের মনের দ্বন্দ্ব। যে দ্বন্দ্ব থেকে তৈরি হয় সম্পর্কের টানাপোড়েন। যা কিনা বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্ক বা পরকীয়া হিসেবেই চিহ্নিত সমাজে। আপাত দৃষ্টিতে খুব সহজ মন হলেও এর পেছনে থাকে নানান ধরনের সূক্ষ সূক্ষ বিষয়। সমাজের চোখে সুন্দর দাম্পত্য জীবনের মনের গহনে চলতে থাকে এরকমই নানাবিধ প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেব নিকেষ।

'প্রথম' গল্পে আপাতদৃষ্টিতে সন্তানহীনতা থেকে মুক্তির আস্বাদ মনে হলেও বাস্তবিক সমাজে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের অবক্ষয়ের দিকটিও ফুটে উঠেছে। গল্পে দময়ন্তীর স্বামী দুঁদে ক্রিমিনাল উকিল লালচাঁদ গুপ্ত। লালচাঁদবাবু যৌন সম্পর্কে অক্ষম ছিলেন। তাদের বাড়িতে এসে হাজির হয় লালচাঁদবাবুর দূর সম্পর্কের উনিশ-কুড়ি বছরের ভাগ্নে রতনলাল। রতনলালের প্রতি সন্তানের মত ভালোবাসার জন্ম নেয় দময়ন্তীর হৃদয়ে। কিশোর রতনলাল মাতৃহৃদয়ের সেই ভালোবাসাকে উপলব্ধি করতে না পেরে মামীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে দময়ন্তী রতনলালকে অনেক বুঝিয়েও ঠিক করতে পারেনি। মামীকে ভোগ করতে উদ্যত হয় রতনলাল। কিন্তু দময়ন্তী তাতে বাধা দিলে আত্মহত্যার হুমকি দেয় রতনলাল। নিজের সন্তান ভাবা রতনলালকে হারানোর ভয়ে দময়ন্তী শেষমেষ নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে রতনলালের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং রতনের সঙ্গে পালিয়ে যায় দময়ন্তী। আবার মন থেকে রতনলালের ঔরসজাত সন্তানকে মেনে নিতে পারেনি দময়ন্তী। সন্তান লাভের আকাঙ্খায় রতনলালকে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল দময়ন্তী। এখানে মাতৃহৃদয়ের এক গভীর ও জটিল দিক প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয় ফুটে উঠেছে রতনলাল ও দময়ন্তীর সম্পর্কের মধ্যে।

খ্যাতি যে বিড়ম্বনা তৈরি করে এবং মানসিকতা বদলে দেয়, তার প্রমাণ 'শরিক' গল্পটি। গল্পের নায়ক সুধাময় মিত্র সাহিত্যিক হিসেবে সুনাম অর্জন করলেও বিবাহিত জীবনে তিনি ছিলেন অস্থিরময়। সুধাময় মিত্রের বাড়িতে স্ত্রী উমা ও তিন সন্তান। কিন্তু যখন কলকাতায় এক স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে উমার খুড়তুতো বোন নীলিমা বাড়িতে আসে তখন থেকে সুধাময় নীলিমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার যখন সাহিত্যিক সুধাময় নিজেকে সিনেমার রঙিন রাজ্যে পাড়ি দেয় তখন তার জীবনে এসে পড়ে অভিনেত্রী অলকা। একাধিক মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জেরে পরিবারে তৈরি হয় অশান্তি।

সমাজ-পরিবারে পারস্পরিক সম্পর্ক গুলো যেন চীনে মাটির মতই ভঙ্গুর! সন্তোষকুমার 'চীনেমাটি' গল্পে এমনই চিত্র অঙ্কণ করেছেন। মূল্যবোধ যে চীনে মাটির মত ভঙ্গুর তা দেখানো হয়েছে গল্পের প্রধান চরিত্র কুঞ্জর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলি প্রতি মুহূর্তে যেন বদলে যাচ্ছে। যেখানে কোন মিল খুঁজে পাচ্ছে না কুঞ্জ। কুঞ্জ যে বকুলকে দিদির মত দেখতো। স্বামীর আদেশে সে যখন অন্যের অঙ্কশায়িনী হয় বকুলের পবিত্রতা মূর্তি এক লহমায় ভেঙে যায় কুঞ্জের কাছে। মেম সাহেব ইন্দ্রানীর স্বাধীনতা কুঞ্জকে নারীকে নতুন ভাবে চিনতে শিখিয়েছিল। বকুল দি-কে সে দেখেছে স্বামীর দাসী রূপে। স্বামীর সমস্ত কথা অন্যায় হলেও মেনে নিয়েছে। শশীও কুঞ্জকে জানিয়েছে এতে বকুল দি-র কোন দোষ নেই। শশীর মতে,

> ''স্বামীর ইচ্ছেয় তো ইস্ত্রির ইচ্ছে। স্বামীর ভালোই তো ইস্ত্রির ভালো। তার আবার আলাদা সুখ কী? আলাদা ইজ্জত কী?''[৮]

'করুণ শঙ্খের মতো' গল্পে নন্দিতা স্বামী বিরামের সঙ্গে সহবাসে তৃপ্ত নয়। সহবাসের চরম মুহূর্তে বিরাম একপ্রকার কষ্ট, যন্ত্রণা অনুভব করত। নন্দিতার শরীরের সমস্ত কিছু পেলেও, কি যেন সে পায় না। তাই যন্ত্রণায় ছটফট করে। নন্দিতাকে অনুপম অফিসে একান্ত সচিব করে নেয়, সেদিন থেকে নন্দিতা বিরামের থেকে দূরে সরে আসে। তারপর হঠাৎ চাকরি খুইয়ে যাওয়া বিরামকে ডিভোর্স দেয় নন্দিতা। কিন্তু অনুপমের সঙ্গে সহবাসের চরম মুহূর্তেও ক্ষত বিক্ষত হয় নন্দিতা। নন্দিতার রোগা কব্জিতে পুরোনো একজোড়া শাঁখা যেন তার পাপবোধের সাক্ষী।

'হয় না' গল্পে সন্দেহের বাতাবারণ আরতি ও সরোজের সম্পর্কের চিড় ধরায়। সরোজের দিদি আরতির গ্রামের এক লোকের কাছ থেকে জানতে পারে এদেশে আসার সময় আরতি লাঞ্ছিতা হয়। দু'মাস পরে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে আসে আরতি। একথা জানতে পেরে সরোজ তাকে বিয়ে করতে রাজি হয় না। কিন্তু দু'দিন পর ভুল বুঝতে পেরে সরোজ আরতির কাছে এসে সে ক্ষমা চায়। যদিও আরতি সিদ্ধান্ত নিমরাজি হয়। আরতি উপলব্ধি করেছে সরোজের ভালোবাসা প্রকৃত ভালোবাসা নয়, যদি তা হত তবে সব কিছু সত্যি জেনেও সে আরতিকে অস্বীকার করতে পারত না। সরোজের মানসিকতাকে বুঝতে পেরেই আরতি জানিয়েছে,

> ''সরোজ, তুমি সব মিথ্যে জেনেই এসেছ। সব সত্যি জেনেও তো আসতে পারোনি।''[৯]

দেশ ভাগের পর ছিন্নমূল হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। গ্রাম থেকে বা পূর্ববঙ্গ থেকে অনেকে চলে আসেন শহর কলকাতায়। কিন্তু থাকবে কোথায়? এ প্রশ্নটাই ঘুরপাক খাচ্ছিল তাঁদের মনে। এমন সময়

কলকাতায় ভাড়া বাড়ির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাই। 'পনেরো টাকার বউ', 'নাতিশীতোষ্ণ', 'সেই রাত্রি' গল্প গুলিতে শহরের ভাড়াটিয়াদের জীবনচর্যা প্রতিফলিত হয়েছে।

তৎকালীন সময়ে পরকীয়া, পতিতা বৃত্তি শুধু নয় সমাজে 'লিভ-ইন'ও চালু ছিল। বিবাহিত নয় কিন্তু দু'জন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ একসঙ্গে একই বাড়িতে বসবাস করেন। এহেন সম্পর্ককে বর্তমানে 'লিভ-ইন' বলে অ্যাখ্যায়িত করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সন্তোষকুমার উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে এরকম জীবনযাত্রার হদিশ দিয়েছেন তাঁর 'কোনও অসতীর কথা' গল্পে।

ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থায় প্রেমেও যে প্রতারণা ঘটবে তা যেন স্বাভাবিক। আর সেই প্রসঙ্গও উঠে এসেছে সন্তোষকুমারের 'জোড় বিজোড়', 'সমীকরণ', 'যাদুঘর', 'তীর্থের কাক' প্রভৃতি গল্পগুলিতে। এখানে প্রেম সম্পর্কিত ধারণা ব্যথিত করে গল্পের চরিত্র গুলিকে। প্রেমিকার শ্রম ও শরীরকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করার ঘটনা পাঠক মানসকে তীব্র কশাঘাত করে।

জীবন-সম্পর্ক শুধু নয় তৎকালীন সময়ে জ্বলন্ত সমস্যা হল দেশ ভাগ। যা কিনা চোখ এড়ায়নি গল্পকারের। কারণ গল্পকার সন্তোষকুমারের আদি বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে। তিনি পড়াশুনার সূত্রে কলকাতায় চলে আসেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেশ ভাগের যন্ত্রণা মানুষের জীবনে কি প্রভাব ফেলতে পারে তা তিনি একাধিক গল্পে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। ভিটেমাটি ছাড়া হওয়ার ঘটনায় মানুষের পেশাও বদল হয়ে যায় তার প্রমাণ 'দ্বিজ' গল্পটি। পূর্ববঙ্গের নিশিকান্ত চক্রবর্তী ছিল যজমানী ব্যবসা। দেশ ভাগের ফলে স্ত্রী নয়নতারাকে নিয়ে সে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। আশ্রয় নেয় ক্যাম্পে। পূর্ব পুরুষের ব্যবসা ধরে রাখার চেষ্টা করেও না পেয়েও শেষে কাজ নেয় সুশীতল বিড়ি ফ্যাক্টরিতে বিড়ি বাঁধার কাজ। প্রথমে সে ইতস্তত করলেও ক্রমশ মানিয়ে নেয় নিজেকে। তবে ক্যাম্পের সবার কাছে সে লুকিয়ে রাখে। ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষার জন্য তাঁর স্ত্রী ক্যাম্পের সবাইকে বলেছিল যে, তার স্বামী এক জমিদার বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করার কাজ পেয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে অন্য শ্রমিকদের গড়ে উঠে নিশিকান্তের সুসম্পর্ক।

দেশ ভাগের প্রভাব পড়েছিল শুধু ব্যবসা নয় চাকরিতেও। 'গিল্টি' গল্পে যায় দেশভাগের পর সলিলের স্টিমার কোম্পানির চাকরি হারায়। ঘরে ছোট ভাই, বিধবা বোন, তার ছেলেকে নিয়ে আবার হাজির হয়। বিধবা বোনকে ছেলে সহ সে পাঠিয়ে দেয় দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে। আর টিবি রোগাক্রান্ত ভাইকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। নিজের মুখে ঠিক মত অন্ন জুটে না। তারপর হাজির হয় একদা প্রেমিকা সীতা। সে তার কাছে আসে কাজের জন্য। সীতার পরিবারে আছে একদা স্কুল মাস্টার বাবা, মা, তিন বোন- মানা, কান্না, আন্না। দেশভাগের পর সীতার বাবার চাকরি থাকে না। তারা চলে আসে বস্তিতে। পরিবারের মুখে অন্ন দেওয়ার জন্য দায়িত্ব নেয় সীতা। সেই জন্য সে আসে একদা প্রেমিক সলিলের কাছে। একদা প্রেমিক সলিল একদা প্রেমিক তার সীতাকে যে প্রস্তাব দেয় তাতে সে প্রথমে রাজি না হলেও পরে রাজি হয়। তারা দু'জনে মিলে দেহ ব্যবসা শুরু করে।

আসতে আসতে শহর কলকাতার মানুষের নাগরিক যন্ত্রণাও তাঁর গল্পে পরিস্ফুটিত হতে থাকে। শুধু জীবন-সম্পর্কের টোনাপোড়েন নয় নাগরিক জীবনের ছোট ছোট যন্ত্রণা যা খালি চোখে পরিলক্ষিত হয় না, তা তিনি 'সমীকরণ','ঈশ্বরের মৃত্যু', 'নাতিশীতোষ্ণ' গল্প গুলিতে সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন। 'ঈশ্বরের মৃত্যু' গল্পে মনসিজ রায়কে সবাই শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত, ভয় করত এমনকি ঈশ্বর তুল্য মনে করে ঘরে ঘরে তার ছবি টাঙিয়ে রাখত। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে সবাই জানতে পারে সেই মুখোশের আড়ালে সে ছিল জুয়াচোর, বিকৃতমনা, গুপ্তহত্যাকারী, স্বার্থান্বেষী। যার ফলে গল্পে সুব্রতদের মত সকলের মনসিজ রায় সম্পর্কে চিন্তাধারণা পাল্টে যায়। মৃণালিনীকে মনসিজ চিরকুমারী করে রেখেছিল নিজের রক্ষিতার প্রয়োজন মেটানোর জন্য। অথচ মৃণালিনী ছিল মনসিজের আত্মীয়া। মৃণালিণীর জন্য একমাত্র কাঁদছে তার ভালোবাসার পাত্র বাঘা কুকুর টাইগার। গল্পে মনসিজ রায়ের নৈতিক অবক্ষয়মূলক রূপটি দেখানো হয়েছে।

যখন সমাজে বেঁচে থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তখন নীতি-নৈতিক, মূল্যবোধ, অবক্ষয় সবকিছুই যেন ঠুনকো হয়ে যায়! 'পর্দা', 'দ্বিজ', 'ঈশ্বরের মৃত্যু','দক্ষিণের জানালা', 'সেই রাত্রি', 'কুসুমাদপি', 'বিষ', 'পরমাঁয়ু','সাধ' প্রভৃতি গল্পে অবক্ষয়িত সমাজকে দেখা যায়। 'পর্দা' গল্পে ভাড়াটে পরিবারের মেয়ে রুনি। বাড়ির দরজা ভেঙে গেলে লজ্জায় ঠিক থাকতে পারে না। পাশের ক্লাব থেকে ছেলেরা, বাড়িওয়ালার ছেলে নির্মল নিলর্জ্জের

মত তাকে দেখে। সাহস করে রুনি তাদের বলতে গেলে তারা সহাস্যে ফেটে পড়ে। নির্মলকে সে খারাপ চোখে দেখে। সেই নির্মলই পরে গোপনে তার সঙ্গে দেখা করে, বাড়ির দরজা সারিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সে রুনির কাছাকাছি আসে এবং তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কেবলমাত্র বিশ্বাস করে রুনি প্রতিদিন নির্মলের ক্রমবর্ধমান সাহসকে প্রশয় দেয়। তার বিনিময়ে সে পায় একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। নির্মলকে বিশ্বাস করা ছাড়া তার উপায় নেই। তাই সে খাঁচার ময়নাকে বলে,

> ''তুই তো আমাদের ঘরের হাল জানিস, আমার বয়স কত তাও জানিস, আমাদের উপায় বা কী? বিশ্বাস না করেও এতদিন তো জিতিনি, না হয় একবার বিশ্বাস করেই ঠকি?''[১০]

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক অনটন এবং সেই কারণে নীতিবোধের অবক্ষয় গল্পটিতে ধরা পড়েছে। অবক্ষয়ের যুগে আশার আলো দেখায় 'সেই রাত্রি' গল্পটি। যেখানে অর্থনৈতিক সমস্যা পরিবারের অন্য সবাইকে স্বার্থপর করে তুললেও একমাত্র মায়ার মধ্যে মূল্যবোধ বজায় ছিল। অর্থাৎ শেষের পরেও যে সূচনা রয়েছে তা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায় সাধারণ মানুষকে, সন্তোষকুমার তাঁর ছোটগল্প গুলিতে সেই চিত্র অঙ্কণ করেছেন।

সন্তোষকুমারের সমস্ত গল্পে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে মানসিক দ্বন্দ্ব বা মনস্তত্ত্ব বিষয়টি। কারণ মনকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি চলতে পারে না। ব্যক্তি পরিচালিত হয় তার মনের দ্বারা। তাই প্রতিটি গল্পে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা গুলিকে সুন্দর ভাবে মনের গভীরে ডুব দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন সাংবাদিকের চোখ দিয়ে। নিজে সাংবাদিক হওয়ায় প্রতিদিন সমাজে ঘটে যাওয়া নানা ধরণের বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকতেন খবরের কাগজ সম্পাদনার জন্য। 'স্ত্রৈণ','তীর্থের কাক', 'সহমরণ', 'দুই কাননের পাখি', 'প্রতিদ্বন্দ্বী','ছায়াঘর', 'সম্রাজ্ঞী' প্রভৃতি গল্পে মনস্তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন গল্পকার। 'কিশোরীর মন' গল্পটিতে কিশোরীর মনে নানা ভাবনা জেগে ওঠে তার দিদির শ্মশান যাত্রার প্রাক্কালে। তার মধ্যে দেখা দেয় যুগপৎ 'কুচিন্তা আর কান্না'। বেঁচে থাকার তীব্র লিপ্সা ধরা পড়ে বিষাদময় এ পরিস্থিতিতেও। কখনও কিশোরীটি ভাবে দিদির দামী শাড়ির কথা, এবার যা তারই হবে। কখনও আবার দিদির দুল জোড়া ও বাবার ইন্সিওরেন্সের টাকার কথা চিন্তা করে সে বলে, ''দিদি মরেছে তাই আমি বেঁচে যাব, আমার-আমার এবার বিয়ে হবে।''[১১] এই গল্পে কিশোরীর আত্মকথন থেকে তার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব চিন্তা মনে আসার জন্য কিশোরীটি নিজেকে ধিক্কার দিলেও মন থেকে সেগুলোকে তাড়াতে সে পারিনি। একথা শুধু কিশোরীটির ক্ষেত্রে নয় প্রায় সব মানুষের ক্ষেত্রে যেন প্রযোজ্য বলে মনে হয়। এখানে মনের অন্তরালে ঘটে চলা নানা ঘটনাকে গল্পে মনোবিদের মতন করে স্থান দিয়েছেন সন্তোষকুমার।

সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্প গুলিতে সমাজের বিভিন্ন দিক যেমন— সামাজিক কাঠামো, শ্রেণী বৈষম্য, মানুষের জীবনযাত্রা, নাগরিক যন্ত্রণা, মূল্যবোধ এবং নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পগুলোতে সমাজের প্রতি লেখকের গভীর পর্যবেক্ষণ এবং সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি সংবেদনশীলতার রূপ বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। ছোটগল্পের মাধ্যমে সমাজের প্রতিচ্ছবি এবং লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন সমাজ-দর্শন পাঠকদের জানতে এবং নিজেদের ভাবনা চিন্তা করতে উৎসাহিত করে।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ১৩।

২. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ২৫।

৩. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ৬২৬।

৪. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮। পৃ. ১২৯।

৫. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ৬।

৬. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ৪৭২।
৭. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ২৬৬।
৮. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ১৬০।
৯. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ৬৯৯।
১০. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬। পৃ. ৬১৯।
১১. ঘোষ, সন্তোষকুমার। গল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮। পৃ. ৮৬।